Vol. 7 | No. 2 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পূর্ব পাকিস্তানের শব্দ সম্ভার ও তার অভিধান

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল ফজল
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.4
Pages	107-114
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পূর্ব পাকিস্তানের শব্দ সম্ভার ও তার অভিধান

Check for updates

আবুল ফজল

হরফ নিয়ে শব্দ আর শব্দ হচ্ছে ভাবের বাহন। হরফের দরকার লেখার সময়, ছাপানোও লেখারই নামান্তর তথা রূপান্তর। কিন্তু শব্দের প্রয়োজন সব সময়, — ভাব প্রকাশ করতে গেলেই শব্দের সাহায্য অপরিহার্য। সব ভাষাতেই অক্ষর বা হরফের সংখ্যা সীমিত ও সুনির্দিষ্ট। এগুলিকে অদলবদল করেই সংখ্যাতীত শব্দ গঠিত হয়, রচিত হয়, যা দিয়ে মানুষ করে থাকে ভাব প্রকাশ। ভাবের রকমফের অনুসারে শব্দ দিয়ে রচিত হয় বাক্য, — এ করেই মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে। এবং এভাবেই ভাষা নিয়েছে রূপ। অতএব শব্দই ভাষার বুনিয়াদ।

মানুষ বা মানুষের সমাজ স্থিতিশীল নয় — ক্রমাগতই চলছে তার পরিবর্তন, বিবর্তন। পালাবদল চলছে ভিতরে ও বাইরে — মনে ও ব্যবহারিক জীবনে। আজকের মানুষ আর হাজার বছর আগের মানুষ, মানুষ বটে কিন্তু এক মানুষ নয় — দশ হাজার বছর আগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের কোন তুলনাই হয় না। তেমনি আগামী দিনের মানুষও ভিন্নতর মানুষ না হয়ে পারে না। বিশেষত এখন বিজ্ঞানের যুগ তথা নতুন নতুন আবিষ্কারও দ্রুত পরিবর্তনশীলতার যুগে মানুষের পরির্তনও দ্রুততর হতে বাধ্য। মানুষ মানে মানুষের জীবন — যে জীবনের পরিধি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। পরিধি বাড়া মানে চাহিদা আর প্রয়োজনেরও বৃদ্ধি, ধ্যান-ধারণার প্রসার ও ব্যাপ্তি। প্রস্তর-লৌহযুগের মানুষের জীবনের পরিধি ও চাহিদার চেয়ে কৃষিযুগের মানুষের জীবনের পরিধি ও চাহিদা যে তার চেয়ে ব্যাপকতর ও জটিলতর তাতে সন্দেহ নেই — আবার প্রয়োজনের তাড়নায় শিল্পযুগে এসে তার ব্যাপ্তির সীমা গেছে আরো বেড়ে — বিজ্ঞানের যুগে এসে মানুষের জীবন আর তার অসংখ্য চাহিদা আজ আর যেন কোন সীমা রেখা মানতে চাইছে না। স্থানের দূরত্ব প্রায় মুচে যাওয়ার পথে, সময়ের দূরত্বও আজ অবিশ্বাস্যরূপে সঙ্কুচিত। আগের দিনের মতো এখন আর এক একটা আবিষ্কারের মাঝখানে সময়ের দীর্ঘ

ব্যবধান নেই — অসম্ভব দ্রুতগতিতে অভাবিত সব আবিষ্কার আজকের দিনে প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার — বিশেষত যন্ত্র ও কারিগরি ক্ষেত্রে।

শব্দ আর ভাষাকে তার আবিষ্কারের সূচনা থেকেই এসবের মোকাবিলা করতে হয়েছে ও হচ্ছে। মাত্র কয়েকটি স্থিতিশীল হরফের সাহায্যে শব্দ মানব ইতিহাসের যুগান্তর ও রূপান্তরের সব রকম ইতিহাসকে ধরে রেখেছে, মানুষকে জুগিয়েছে যুগোপযোগী বাহন। তাই মানুষের জীবনের পরিধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আর ভাষার পরিধিও অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে, না বেড়ে উপায় নেই। ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।

শিকার যুগের পরিমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে কৃষিযুগের এবং কৃষিযুগের শব্দ দিয়ে শিল্পযুগের বা বিজ্ঞান যুগের চাহিদা কিছুতেই মেটাতে পারে না। তাই যুগে যুগে সব সভ্য ভাষাতেই নতুন নতুন শব্দ গড়ে উঠেছে, রচিত হয়েছে নতুনতর শব্দরূপ। তাই শব্দের ইতিহাস মানে মানুষের ইতিহাস, তার বিবর্তনের ইতিহাস, তার সামাজিক ক্রম বিকাশের ইতিহাস। মানুষের মতো শব্দও চলিষ্ণু। শব্দ তথা ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের সম্পর্কের মতই নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন। তাই যথাযথভাবে সংগৃহীত হলে যে কোন ভাষার অভিধান সে-ভাষাভাষীদের সব চেয়ে যে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস — তার ঐতিহাসিক উপকরণ — যুগপৎ তার মনোজীবন আর সমাজ-জীবনের, তা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

এ যাবৎ বাংলা ভাষায় যা অভিধান রচিত হয়েছে তা কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গকে কেন্দ্র করেই রচিত। মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে একমাত্র কাজী আবদুল ওদুদই একটি চলনসই অভিধান সংকলন করেছেন। তিনিও পরিমিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেই তাঁর সংকলন কার্যের ইতি টেনেছেন। তাঁর ও রাজশেখর বসুর কিম্বা ঋষি দাসের বা এ ধরণের স্বল্প কলেবর আরো যা দু'একখানা অভিধান বাজারে চলতি আছে, তা দিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের 'উপস্থিত কাজ' অর্থাৎ শব্দার্থ ও বানান দেখার কাজ চলে যায়, কিন্তু তার বেশী কৌতূহল এ সব অভিধান চরিতার্থ করতে পারে না।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস যে অপরিমিত শ্রম স্বীকার করে দু'খণ্ড অভিধান সংকলন করে গেছেন, তাও আজকের বুদ্ধিজীবিদের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। তবে কিছুটা ব্যাপক ও সার্বিক ভিত্তিতে অভিধান সংকলনের পথ যে তিনি দেখিয়ে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বঙ্গীয় শব্দকোষই বোধ করি বাংলা ভাষার সব চেয়ে বৃহদাকার অভিধান। আকারে তাঁর অভিধানটি সব চেয়ে বড় হলেও তাঁর পূর্ববর্তীদের সংকলিত অভিধানের দোষ-ত্রুটী থেকে তাঁরটিও মুক্ত নয়। এসব অভিধানের একটি বড় ত্রুটী হচ্ছে এর কোনটি-ই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত নয়। ফলে বাংলা ভাষার একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা এসব অভিধানে প্রতিফলিত হয়নি। প্রায় সব কয়টি অভিধানেরই দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমবঙ্গীয়, পশ্চিমবঙ্গীয় অর্থে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে-দৃষ্টি পূর্ববঙ্গের মানুষের ভাষা ও তার সাহিত্যের প্রতি যথাযথভাবে পড়েনি ও সেদিকে হয়নি আকৃষ্ট। অথচ বাংলাদেশের বড় অংশ হলো পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তান আর বঙ্গ ভাষাভাষী লোক সংখ্যাও এখানেই বেশী। কাজেই পূর্বপাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার কোন অভিধানই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। যে কোন অভিধানের প্রধান উপকরণ — রচিত সাহিত্য আর মানুষের মুখে ব্যবহৃত ভাষা।

বাংলা সাহিত্যের চর্চা পশ্চিমবঙ্গে বেশী হয়েছে, উন্নত ও সমৃদ্ধ সাহিত্যও রচিত হয়েছে সেখানেই বেশী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এসব সাহিত্যে যে-সব শব্দ স্থান পেয়েছে বাংলা অভিধানে সে সব শব্দেরই স্থান স্বভাবতই বেশী যায়গা দখল করেছে। এ সম্বন্ধে আপত্তি যুক্তিহীনও নিরর্থক। তার উপর পশ্চিম বঙ্গের আরো একটি বিশেষ সুবিধা সেখানকার অধিকাংশ জেলার কথ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার ব্যবধান পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ জেলার কথ্য ভাষার মতো অতখানি দুস্তর নয়। ঐখানকার সাহিত্যিক ও অভিধান-সংকলয়িতাদের পক্ষে এটিও কম সুবিধার কথা নয়।

পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের ভাষা এক। এখনো তেমন লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য দেখা দেয়নি। স্বাধীনতার পর কারো কারো রচনায় আর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ও মুদ্রিত সাময়িকী ও পুস্তক পুস্তিকায়

কিছুটা অধিকমাত্রায় অপ্রচলিত উর্দু-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে শুধু। না হয় সাহিত্যের কাঠামো ও দৃষ্টিভংগী আজো এক ও একই। কালক্রমে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমে বঙ্গের সাহিত্যের ভাষায় যদি কোন পার্থক্য দেখা দেয়, সে পার্থক্য আমার বিশ্বাস, আমেরিকার ইংরেজি আর ইংরেজের ইংরেজির চেয়ে বেশী হবে না।

আমাদের পত্র পত্রিকাগুলির নাম যে আজাদ, ইত্তেফাক, জেহাদ, মাহেনও, জমানা, ইনসাফ, তকবির তা অবস্থার হেরফেরেরই ফল। এসব ভাষাকে পৃথকীকরণের নমুনা মোটেও নয়। কারণ নামের মতো কাম কোথাও দেখা যায় না — এসব পত্র-পত্রিকায়ও যে ভাষা লেখা হয় তা খাঁটি বাংলা ভাষাই। পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে তা মোটেও তফাৎ নয়। আর তার শতকরা সাড়ে নিরানব্বইটি শব্দ প্রচলিত বাংলা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত নামগুলি হয়ত বাংলা কোন অভিধানেই মিলবে না। অর্থ জানতে হলে আরবী, ফারসী-উর্দু অভিধান ঘাঁটতে হবে। কিন্তু আগামী দিনের বাংলা অভিধানে এসব শব্দকে স্থান দিতেই হবে। না দিলে যে অভিধান অপূর্ণাঙ্গ থাকবে! অভ্যাস ও বহু ব্যবহারের ফলে — বলতে বলতে, শুনতে শুনতে এরকম আরো বহু বিদেশী (বিদেশী মানে অ-বাংলা) শব্দ আমাদের রপ্ত হয়ে গেছে। হয়ে পড়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যতই নিবিড় হবে এবং যতই হবে ঘনিষ্ঠতর ওখানকার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও ততই বাড়বে। ফলে এরকম শব্দ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। আজাদীর পর বহু উর্দুভাষীই পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। কালক্রমে তাদের সন্তানসন্ততিরা হয়তো বাংলাভাষীই হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পূর্ব পুরুষের ভাষার সব শব্দ বেমালুম ভুলে যাবে, বিশেষ করে ঘরোয়া শব্দ, তা কখনো হতে পারে না। এ ভাবেও বেশ কিছু সংখ্যক অ-বাংলা শব্দ পূর্ব পাকিস্তানের ভাষায় স্থান করে নেবে, হয়ে পড়বে বাংলা ভাষার অঙ্গ। কাজেই বাংলা ভাষার যে সব প্রচলিত অভিধান রয়েছে তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের

চাহিদা ও প্রয়োজন কিছুতেই পুরোপুরি মিটতে পারে না। তাই নতুন অভিধান চাই।

তবে আমাদের বিভিন্ন জেলার উপভাষায় একের সঙ্গে অপরের যে দুস্তর পার্থক্য রয়েছে, অভিধান সংকলনের পথে তাও কম অন্তরায় নয়। প্রতি জেলার উপভাষার পৃথক পৃথক অভিধান সংকলন সে তো আরো দুরূহ ব্যাপার আর তার প্রয়োজনও অত্যন্ত সীমিত। এখন আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে-শব্দ সম্ভার দিয়ে আমাদের সাহিত্য রচিত হয়েছে—মায় পুথি সাহিত্য ও লোকগীতি ছড়া ধাঁধাঁ ইত্যাদি, আর যা রচিত হচ্ছে ও অদূর ভবিষ্যতে যে-সব শব্দ সাহিত্যে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলন। পূর্ণাঙ্গ কথাটিও আপেক্ষিক। কারণ কোন অভিধানই প্রথম সংস্করণে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বহু পাঠকের বহু অভিজ্ঞতায় আর বহু সংস্করণের যোগ বিয়োগেই অভিধান সম্পূর্ণতা পেয়ে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চমধ্যবিত্ত ও নগরবাসীর সংখ্যা খুবই নগণ্য—আমাদের অধিকাংশ মানুষই নানা বৃত্তিজীবী। কামার, কুমার, তেলী, তাঁতী, জেলে, মাঝি—এ সব মানুষের দৈনদিন জীবন ও পেশার সঙ্গে যে-সব জিনিসের অপরিহার্য সম্পর্ক তার নাম-ধাম আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। ঐসব শব্দ সংকলিত হয়ে অভিধানভুক্ত না হলে তা শিক্ষিতসমাজে চিরকালই অবোধ্য থেকে যাবে। যেহেতু শিক্ষিতরাই সাহিত্য রচনা করে থাকেন, তাঁরা যদি জনসাধারণ বস্তু-বিশেষকে কি নামে প্রকাশ করে, তা না জানেন, তা হলে দেশের অগণিত বৃত্তিজীবীদের আর সাধারণ মানুষের জীবন কখনো সাহিত্যে যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হতে পারবে না।

নাম জানাই তো জ্ঞানের অ. আ.। সভ্যতার প্রায় সূচনার যুগে স্বয়ং সক্রেটিসও বলে গেছেন : The knowledge of names is a great part of knowledge, নাম আর নামের অর্থ জানার প্রধান উপায় অভিধান। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যত অভিধান সংকলিত হয়েছে, তা সবই একক প্রচেষ্টার ফল। ফলে এর কোনটাই পূর্ণাঙ্গ ও প্রতিনিধিত্বমূলক হয়নি। একটা জাতি বা দেশের শব্দ সম্ভারের তুলনায় ব্যক্তি বিশেষ যত

একনিষ্ঠ আর পরিশ্রমীই হোন না কেন, তাঁর পক্ষে শব্দের সব মূল উৎস ও ভাণ্ডারের সন্ধান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তির শক্তি আর আয়ুর একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। কিন্তু শব্দ অসীম আর তার ক্ষেত্রও বহু বিচিত্র। ইংরেজি ভাষার দশ খণ্ডে প্রকাশিত New English Dictionary খানি তৈরী আর ছাপা হয়ে বেরুতে নাকি সত্তর বছর লেগেছিল। এর মধ্যে একাধিক মূল সম্পাদকের মৃত্যু ঘটেছে, শতাধিক উপসম্পাদক ও সংগ্রাহকদের অনেকেরও এ একই গতি হয়েছে, এসব ব্যাপারে ওদের সংগঠন এত মজবুত যে এতেও কাজের গতি ব্যাহত হয়নি। এ অভিধানের প্রথম খণ্ড বের হওয়ার চুয়াল্লিশ বছর পরে প্রকাশিত হয় অন্তিম খণ্ড। এতে বুঝতে পারা যায় কি নিষ্ঠা আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী এ অভিধানের পেছনে বছরের পর বছর কাজ করে গেছেন। যেন-তেন প্রকারে তাড়াহুড়ো করে অভিধানটাকে বাজারে বের করে দেওয়ার লোভ সম্পাদক ও উদ্যোক্তারা সর্বতোভাবে দমন করেছেন এটাও কম প্রশংসার কথা নয়। তাঁদের সামনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের শক্তিতে যতখানি পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব তেমন একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান তারা ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যকে দিয়ে যাবেন। এ অভিধান ইংরেজ জাতির মাতৃভাষা প্রীতিরও এক উজ্জ্বল নজির। বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ সংগ্রহ আর যাচাই-বাছাইর জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি করে, যেমন: পুরোনো ইংরেজি কমিটি, চসার কমিটি, শেক্সপিয়র কমিটি, উপভাষা কমিটি ইত্যাদি গঠন করে সংকলনের কাজ আর পরিশ্রম ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, পরে মূল কমিটি সংকলিত শব্দগুলিকে যাচাই-বাছাই করে শেষ খসড়া দাঁড় করিয়েছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের অভিধান সংকলনের ব্যাপারে আমাদেরও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরও রয়েছে শব্দের নানা উৎস — প্রাচীন, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ ছাড়াও আমাদের বেশ একটা বড় কলমী অর্থাৎ হাতে লেখা সাহিত্যও রয়েছে। এসব সাহিত্য থেকে শব্দ সংকলন ও যাচাই-বাছাইর জন্য আলাদা আলাদা কমিটি অত্যাবশ্যক। বাংলা একাডেমী যে-অভিধান সংকলন করছেন, আশা করি, তা এ ভাবেই সংকলিত হচ্ছে। এ অভিধান বের হলে হয়ত আমাদের এক বড় অভাব দূর হবে।

এখনো আমাদের গ্রামে গ্রামে বহু কবি ও কবিয়াল আছেন। তাঁরা মুখে মুখেই কবিতা ও গান রচনা করে থাকেন। গ্রাম-দেশের যে-কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা উপলক্ষেও গ্রাম্য কবিরা কবিতা রচনা করে সস্তা কাগজে ছাপিয়ে হাটে হাটে গেয়ে গেয়ে বিক্রী করে থাকেন। এসবও সংগৃহীত হওয়া উচিত — এসব রচনায় গ্রাম্য শব্দের চমৎকার অর্থপূর্ণ ব্যবহার ও তির্যক ভঙ্গী দেখে অনেক সময় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

বাংলা ভাষা জীবন্ত ভাষা — ক্রমাগতই এর পরিবর্তন চলছে, নতুন নতুন শব্দ ও ভংগীর অনুপ্রবেশ ঘটছে অহরহই। দিন দিনই গ্রাম আর শহর এসে যাচ্ছে কাছাকাছি। ফলে শব্দ আর ভাষার অপরিচয় আর দূরত্বও যাচ্ছে কমে। সংকলকদের এ বিষয়েও অবহিত থাকতে হবে।

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্বন্ধে প্রায় কুড়ি-একুশ বছর আগে আমি লিখেছিলাম যা, তার খানিকটা উদ্ধৃতি, আশা করি, অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না ঃ "বাঙলা ভাষা যদি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু না হয়, তা হলে তার প্রসার ও সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। কোন কোন বিষয়ে শব্দসম্পদের দিক দিয়ে বাঙলা ভাষা দরিদ্র স্বীকার করি, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রতিদিনের ব্যবহার ও তার প্রয়োজনে নিত্য নতুন শব্দ সৃষ্টি হবে এবং এই সৃষ্টি শুধু সংস্কৃত ধাতু থেকেই করতে হবে এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়মও চলবে বলে মনে হয় না। একাজে আমরা সহায়তা পাবো আমাদের অফুরন্ত গ্রাম্য শব্দ সম্পদের কাছে। নৌকার তিন চারটা অংশের নাম হয়ত আমরা শিক্ষিত লোকেরা জানি, কিন্তু নৌকার মাঝি হয়ত পঞ্চাশটা অংশের পঞ্চাশটা নাম বলতে পারবে, ঘর সম্বন্ধেও আমাদের সাহিত্যিক শব্দ ঐরকম শোচনীয় ভাবেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বা ঘরামি একটা চালেরই হয়ত বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম জানে ও ব্যবহার করে। বাঙলার পল্লীবাসীর জীবনের ছবি আঁকতে গেলে বাঙ্গালী সাহিত্যিকও শব্দের অভাবে চাষীর ঘরদুয়ারের ও জীবন-যাত্রার একটা খাঁটি বর্ণনাই দিতে পারবে না। বাঙলার চাষীমজুর, তাঁতি জেলে, মাঝিমাল্লা, যারা দেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তাদের জীবনের ছবি এখনো আমাদের সাহিত্যে ফুটে উঠেনি এবং এদের জীবনের যথাযথ ছবি

আঁকবার চেষ্টা করলেই আমাদের সাহিত্যিক ভাষার দারিদ্র্য সহজেই উপলব্ধি হবে।"[১] শুধু ঘর বা নৌকা নয় জমি, ধান, শস্য ও উৎপন্ন ফসলের যত রকম নাম আছে তার কতটুকুই আমরা জানি। পূর্ব-পাকিস্তানের নদনদীনালা ও সমুদ্রে কতরকম মাছ যে আছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। ছোট ছোট ছবি দিয়ে এমন কিছুর নাম ও পরিচয় যদি অভিধানে সংকলিত হয়, তা হলে সে অভিধানের মূল্য ও আকর্ষণ যে কতখানি বেড়ে যাবে তা অনুমেয়। সুসংকলিত ও সুসম্পাদিত অভিধান সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের পেশাগত জীবনে এক মস্ত বড় হাতিয়ার। পূর্ব-পাকিস্তানের বিচিত্র শব্দসম্ভার নিয়ে ঐরকম অভিধান সংকলিত ও প্রকাশিত হলে তা যে শুধু এখানকার বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক অপরিহার্য সম্পদ হবে তা নয়, অনুসন্ধিৎসু বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের জন্যও তা হবে এক নির্ভরযোগ্য নিদর্শন।

১. লেখকের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৮।